সুখ বলা হয়েছে। অর্থাৎ দুঃখাভাব অর্থেই 'সুখ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। তাই দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ।

বৌদ্ধমতে, নির্বাণ হলে পুনর্জন্ম রোধ হয়, ফলে সকল দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। বৌদ্ধাচার্য নাগসেন নির্বাণকে আনন্দময় অবস্থা বলেছেন। তিনি নির্বাণের অবস্থাকে বোঝাতে গিয়ে রূপকের সাহায্যে বলেছেন ঃ "নির্বাণ সমুদ্রের মত গভীর, পর্বতশৃঙ্গের মত উঁচু, মধুর মত মিষ্টি।" আসলে নির্বাণের প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধির বিষয়, সাধারণ অভিজ্ঞতা দিয়ে একে বর্ণনা করা যায় না।

আচার্য শঙ্করের মতে, মুক্তি কেবল দুঃখাভাবের অবস্থা নয়; মুক্তি আনন্দময় অবস্থা। জীব ব্রহ্মস্বরূপ—মুক্তিতে জীবের এই জ্ঞান হয়। ব্রহ্ম আনন্দ স্বরূপ। তাই ব্রহ্মই নিরতিশয় সুখ। শঙ্করের মতে, মুক্তিতে জীবের নতুন কিছু প্রাপ্তি হয় না, কেননা জীব সর্বদাই ব্রহ্ম স্বরূপ। কিন্তু বন্ধন দশায় সে তা বিস্মৃত হয়। তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানের দ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হলে প্রাপ্ত আনন্দের (ব্রহ্ম স্বরূপের) প্রাপ্তি হয়।

জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি

মুক্তি দুপ্রকার ঃ জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি। শরীর বা দেহ থাকাকালীন অবস্থায় অর্থাৎ জীবিত অবস্থায় যে মুক্তি হয়, তাই জীবন্মুক্তি। মৃত্যুতে দেহের বিনাশ হলে যে মুক্তি হয় তাকে বিদেহ মুক্তি বলে।

বৌদ্ধ, সাংখ্য, যোগ, জৈন ও অদ্বৈতবেদান্তী জীবন্মুক্তি স্বীকার করেন। বৌদ্ধ মতে নির্বাণ হল জীবন্মুক্তি। বুদ্ধদেব নির্বাণ লাভের পর সুদীর্ঘ ৪৫ বছর জীবিত ছিলেন। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তি ভাজা বীজের মতো। ভাজা বীজ যেমন অঙ্কুরিত হয় না, সেরূপ নির্বাণপ্রাপ্ত ব্যক্তি জগতে থাকেন, মানুষের দুঃখ দূর করার চেষ্টা করেন, কিন্তু কোন কিছুতে আসক্ত হন না।

ন্যায়মতে, মুক্তির অবস্থায় দেহের বিনাশ ঘটে এবং পুনরায় জীবের দেহের উৎপত্তির আর কোন সম্ভবনা থাকে না ('ন চ পুনরাবর্ততে')। এই মুক্তি বিদেহমুক্তি। ন্যায়মতে, বিদেহ মুক্তিই প্রকৃত মুক্তি।

শঙ্করাচার্য জীবন্মুক্তি ও বিদেহ মুক্তি উভয় প্রকার মুক্তি স্বীকার করেন। শরীর প্রারব্ধ কর্মের ফল। তাই মুক্তিলাভের পরও শরীর থাকতে পারে। কিন্তু যিনি মুক্ত অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞানী তিনি শরীরের সঙ্গে নিজেকে অভিন্ন বলে মনে করেন না। তিনি তখন নিরাসক্তভাবে জগতে অবস্থান করেন। তাই তিনি জাগতিক দুঃখের দ্বারা পীড়িত হন না। শঙ্কর একেই 'জীবন্মুক্তি' বলেছেন। "যিনি দেহে, ইন্দ্রিয়াদিতে এবং

পর্যন্ত বা সীমা আছে। কিন্তু মুক্তির অবস্থায় সর্ববিধ দুঃখের সর্বতোভাবে অবসান হয়, দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশ হয়। ন্যায়মতে যেহেতু মিথ্যা জ্ঞান হতে আত্মার জন্ম অর্থাৎ দেহধারণ হয়, তাই মিথ্যা জ্ঞান জীবের বন্ধনের কারণ। দেহে আত্মবুদ্ধি হল মিথ্যা জ্ঞান। এর বিপরীত জ্ঞান দেহে অনাত্ম বুদ্ধি হল তত্ত্বজ্ঞান। তত্ত্বজ্ঞান বা আত্মসাক্ষাৎকার মুক্তির চরম কারণ। তাই মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে (১/১/১) বলেছেন ঃ "তত্ত্বজ্ঞানাৎ নিঃশ্রেয়সাধিগমঃ।" অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান হতে নিঃশ্রেয়স বা মুক্তিলাভ হয়।

বৌদ্ধ দর্শনে দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিকেই নির্বাণ বা মুক্তি বলা হয়েছে। নির্বাণের অবস্থায় কামনা-বাসনা দগ্ধ হওয়ায় তৃষ্ণার ক্ষয় হয় এবং দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়।

সাংখ্য-যোগ মতে, চৈতন্যস্বভাব আত্মা বা পুরুষ এবং অচেতন প্রকৃতির অভেদ জ্ঞান (অবিবেক খ্যাতি বা অবিবেক জ্ঞান) পুরুষের বন্ধনের কারণ। প্রকৃতি-পুরুষ-ভেদ জ্ঞান (বিবেক খ্যাতি) দুঃখের ঐকান্তিক ও আত্যন্তিক নিবৃত্তির উপায় ("ব্যক্ত-অব্যক্ত-জ্ঞ-বিজ্ঞানাৎ")।

অদ্বৈতবাদী আচার্য শঙ্করের মতে ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। মায়া বা অজ্ঞানের জন্য আত্মা ও দেহের সংযোগ ঘটে এবং জীব নিজস্বরূপ বিস্মৃত হয়। ফলে জীব নানাবিধ দুঃখে পীড়িত হয়। তত্ত্বজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান হলে অজ্ঞানের নিবৃত্তি হয় এবং জীব যে ব্রহ্মস্বরূপ তার প্রকাশ হয়। ঐ ব্রহ্মস্বরূপের প্রকাশ হলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয়। একেই মোক্ষ বলে। মোক্ষের অবস্থায় জীব ব্রহ্মই হয়ে যায়। "ব্রহ্মবেদ ব্রহ্মৈব ভবতি" অর্থাৎ যিনি পরম ব্রহ্মকে জানেন তিনি ব্রহ্মই হয়ে যান। এই মুক্তি সাযুজ্য মুক্তি।

মোক্ষ কি আনন্দময় অবস্থা?

মোক্ষের অবস্থায় সুখ হয় কি না বা মোক্ষ আনন্দময় অবস্থা কি না—এ প্রশ্নে ভারতীয় দর্শনে মতভেদ দেখা যায়।

মোক্ষের অবস্থায় দুঃখ হতে চিরমুক্তি লাভ হয়। মোক্ষলাভ হলে দুঃখ পুনরায় ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। এ বিষয়ে ভারতীয় দার্শনিকেরা অভিন্ন মত পোষণ করেন।

শৈব সম্প্রদায়ভুক্ত নৈয়ায়িক ভাসর্বজ্ঞ তাঁর ন্যায়সার গ্রন্থে বলেছেন ঃ মুক্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশের সঙ্গে নিত্য সুখের অভিব্যক্তি হয় এবং মুক্ত পুরুষ নিত্য সুখ অনুভব করে। কিন্তু নৈয়ায়িকেরা বলেন ঃ মুক্তিতে পুরুষের আত্যন্তিক সুখভোগের কথা শাস্ত্রে বলা হলেও শাস্ত্রবাক্যে মুক্ত পুরুষের আত্যন্তিক দুঃখ নিবৃত্তিকেই আত্যন্তিক

অবহিত নয়। জীবনের চরমলক্ষ্য সম্পর্কে অবহিত না থাকার জন্য সাধারণ মানুষের অর্থ ও কামের প্রতি আকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক। তাই বৈদিক শাস্ত্রে অর্থ ও কামকে পুরুষার্থ বলা হয়েছে। ধর্মশাস্ত্রে বলা হয়েছে—ধর্ম, অর্থ, কাম—এই তিনটি পুরুষার্থকেই সমানভাবে সেবা করতে হবে। যে মানুষ একটি পুরুষার্থকে প্রাধান্য দিয়ে অন্য দুটিকে অবহেলা করে সে একেবারে বোকার অধম ("ধর্মার্থকামাঃ সমমেব সেব্যাঃ। যো হি একসক্তঃ স জনো জঘন্যঃ")।* কিন্তু কাম অর্থাৎ ইন্দ্রিয় উপভোগ জনিত সুখের কামনা আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় বাধা। এদের মধ্যে যৌন সুখ এবং ক্ষুধা বোধ সবচেয়ে শক্তিশালী ও বিপজ্জনক। এদের নিয়ন্ত্রণ আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে অপরিহার্য (sine qua non)। বৈদিক দৃষ্টিতে অর্থ ও কাম ক্ষুদ্রতর মঙ্গলরূপে স্বীকৃত। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্রানুযায়ী অনিয়ন্ত্রিত অর্থ ও সুখের কামনা পরমার্থলাভে বাধা সৃষ্টি করে এবং মানুষের আত্মবিনাশের পথকে প্রশস্ত করে। তাই বৈদিক শাস্ত্রে ধর্মের দ্বারা অর্থ ও কামের লোভকে নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলা হয়েছে। ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত না হলে অর্থ ও কামের কোনরূপ নৈতিক মূল্য নাই।

সব ভারতীয় শাস্ত্রেই প্রবৃত্তি মার্গের মানুষের ক্ষেত্রে ধর্ম, ধর্মের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অর্থ ও কাম অনুসরণের কথা বলা হয়েছে। ধর্মের দ্বারাই শুভ ও অশুভ কর্মের পার্থক্য করা সম্ভব হয়। তাই ত্রিবর্গের মধ্যে ধর্ম প্রথম পুরুষার্থরূপে উল্লিখিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, সমস্ত ভারতীয় শাস্ত্রে ও উচ্চস্তরের সাহিত্যে নিয়ন্ত্রণকারী নীতিরূপে ধর্মকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। "ধর্ম-অবিরুদ্ধো.....কামঃ অস্মি"—"আমিই ধর্মের অবিরোধী কাম" ভগবদ্‌গীতায় (৭/১১) শ্রীকৃষ্ণের এই উক্তিতে এ কথাই সমর্থিত হয়েছে।[৭] ধর্মের অবিরোধী কাম বলতেই বুঝতে হবে যে, এখানে স্বেচ্ছাকৃত কিছু আত্মদমন আছে। ধর্মবিরুদ্ধ কাম বর্জনীয়।

ধর্মের সঙ্গে অর্থ ও কামের সম্বন্ধের আলোচনায় দেখা গেল যে, ধর্ম অর্থ ও কামের নিয়ন্ত্রকরূপে কাজ করে। কিন্তু প্রশ্ন হল ঃ ধর্মের কি নিজস্ব কোন উদ্দেশ্য নাই? এ প্রশ্নে দুটি উত্তর আমরা পাই।

(১) মীমাংসক কুমারিল ভট্ট বলেন, বৈদিক বিধি বা ধর্ম পালন করতে হবে, যেহেতু তা সুখলাভে সহায়ক। দীর্ঘকাল নিষ্ঠার সঙ্গে ধর্মাচরণ করলে ইহলোক ও পরলোকে সুখলাভ হয়, যাকে 'অভ্যুদয়' বলে। কিন্তু ধর্মের ফল ধর্মাচরণের অব্যবহিত

---

* "সীতা", নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ী, *বর্তমান পত্রিকা*, শারদ সংখ্যা, ১৪১৫।

৭. "Philosophy of Values", M. Hiriyanna, *The Cultural Heritage of India*, Vol. III, pp. 647-648.

পরে লাভ করা যায় না। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হল ধর্ম কোন না কোন ফল উৎপাদন করবেই। তবু মানুষ ধর্ম সম্পর্কে উদাসীন। মানুষের এই দূরদৃষ্টির অভাব লক্ষ্য করেই ব্যাসদেব মহাভারতের স্বর্গারোহণ পর্বে বলেছেন ঃ "ধর্ম পথে অর্থ ও কামলাভের কথা আমি চিৎকার করিয়া বলিতেছি, কিন্তু কেহ তাহা শুনিতেছে না।"

(২) মীমাংসক প্রভাকরের মতে, ধর্ম স্বতঃই মূল্যবান। সুতরাং ধর্মাচরণের জন্য মানুষের কাছে আবেদন করা হাস্যকর। কেননা মানুষ শুধু জীব নয়, সে নৈতিক আচরণের কর্তা। তাই যা করা উচিত, তা সে করতে পারে। যা করা অনুচিত, তা করা থেকে সে বিরত থাকতে পারে। ধর্মকে লক্ষ্যরূপে স্বীকার না করলে ধর্মকে উপায় বলতে হয় এবং তা ক্ষুদ্রতর মূল্য কাম লাভের উপায় বলতে হয়। তাই ধর্মকে ধর্মের জন্যই আচরণ করা কর্তব্য। প্রভাকরের এই ব্যাখ্যা 'কর্তব্যের জন্য কর্তব্য' ('duty for duty's sake) কান্টের এই নৈতিক বিধির কথা মনে করিয়ে দেয়।

মোক্ষ ঃ ভারতীয় শাস্ত্রে উল্লিখিত চতুর্বর্গ-এর মধ্যে চতুর্থ ও সর্বশ্রেষ্ঠ পুরুষার্থ হল মোক্ষ। মুক্তি, অপবর্গ, কৈবল্য, নির্বাণ, নিঃশ্রেয়স প্রভৃতি শব্দ মোক্ষ শব্দের সমার্থক। মোক্ষ পরমপুরুষার্থ। পুরুষার্থের পরিকল্পনায় মোক্ষ অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় ধর্মের ধারণায় গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন ঘটে। ধর্ম উপায় (means) বলে পরিগণিত হলেও তা কাম বা সুখলাভের উপায় নয়। ধর্মের অব্যবহিত লক্ষ্য হল সত্ত্বশুদ্ধি, যা সম্ভব হয় আমাদের নিম্নতর ও স্বার্থপর প্রবণতাসমূহের শোধনের দ্বারা এবং ধর্মের পরমলক্ষ্য হল আত্মোপলব্ধি বা মোক্ষলাভ।

মোক্ষের স্বরূপ
(The nature of liberation)

ভারতীয় দর্শনে জড়বাদী ও বেদবিরোধী চার্বাক ছাড়া ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা, বেদান্ত প্রভৃতি বৈদিক ও জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক দর্শনে মোক্ষকে পরমপুরুষার্থ বলা হয়েছে।

সমস্ত বৈদিক দর্শনে, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি অবৈদিক দর্শনে মোক্ষ বলতে ত্রিবিধ দুঃখের (আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক) আত্যন্তিক নিবৃত্তিকে বোঝান হয়েছে। মুক্তিতে এই ত্রিবিধ দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হয়। অর্থাৎ দুঃখ ফিরে আসার সম্ভাবনা থাকে না। মহর্ষি গৌতম ন্যায়সূত্র গ্রন্থে (১/১/২২) বলেছেন ঃ "তদত্যন্তবিমোক্ষোঽপবর্গঃ" অর্থাৎ জীবের সকল প্রকার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তিই অপবর্গ। প্রলয়কালীন অবস্থায় জীবের যে সর্ববিধ দুঃখশূন্য অবস্থা তার

মতে, বেদ বাক্যের দ্বারা জ্ঞাপিত কর্মই ধর্ম ('চোদনা লক্ষণোঽর্থ ধর্মঃ')। বেদ-বিহিত যাগযজ্ঞাদি কর্মই ধর্ম। ধর্ম বিষয়ে চোদনা বা বেদবাক্যই প্রমাণ। গৌতম ধর্মসূত্র গ্রন্থে বলেছেন ঃ কেবলমাত্র যাগযজ্ঞাদি কর্মের চেয়ে আত্মগুণ বলে অভিহিত দয়া ও পবিত্রতার স্থান অনেক উচ্চে। এরূপ ধর্মের আলোচনা করতে গিয়ে যাজ্ঞবল্ক্য যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতিতে বলেছেন ঃ অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ, ইন্দ্রিয়নিগ্রহ, দান, দম, দয়া, ক্ষান্তি এই নটি ধর্মের সাধন।[৬]

মনু মনুসংহিতায় (৬/১২) বলেছেন ঃ "ধৃতিঃ ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিন্দ্রিয় নিগ্রহঃ। ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্।" অর্থাৎ "ধৃতি (ধারণ বা ধৈর্য), ক্ষমা, দম (সৎ আচরণ), অস্তেয় (চুরি না করা), শৌচ (দেহ ও মনের শুচিতা), ইন্দ্রিয় নিগ্রহ (ইন্দ্রিয়ের নিয়ন্ত্রণ), ধী (শাস্ত্র জ্ঞান), বিদ্যা (আত্মজ্ঞান) সত্য ও অক্রোধ এই দশটি ধর্মের লক্ষণ।" যে ব্যক্তির মধ্যে এই গুণগুলি বর্তমান অর্থাৎ যিনি এই গুণগুলি অর্জন করেছেন তিনিই ধার্মিক।

অর্থ ঃ ভারতীয় শাস্ত্রে অর্থকেও পুরুষার্থ বা মানুষের কাম্য বলা হয়েছে। অর্থ দ্বিতীয় পুরুষার্থ। কিন্তু অর্থ বা ধন (wealth) স্বতঃই জীবনের লক্ষ্য রূপে বিবেচিত হয়নি। অর্থ আধ্যাত্মিক জীবনের (spiritual life) পক্ষে প্রবল বাধা বলেই নিন্দিত হয়নি, ইহজগতেও অর্থ নানা সঙ্কট, দুশ্চিন্তা ও উদ্বেগের উৎস বলেও নিন্দিত হয়েছে। অর্থ সুখলাভের উপায়মাত্র। অর্থ কেবল উপায়, কিন্তু উপেয় নয়। অর্থ ধর্মানুকূল হলেই পুরুষার্থ বলে বিবেচিত হয়। ধর্মানুকূল অর্থই যথার্থ পুরুষার্থ। অর্থের উদ্দেশ্য ধর্মলাভ। ধর্মাচরণের জন্য অর্থ প্রয়োজনীয়। ধর্ম বিরুদ্ধ অর্থ পরিত্যাজ্য। অর্থ উপার্জনে যে শুচি, সেই শুচি। মনুর মতে, অর্থের শুচিতা সর্বাগ্রে রক্ষা করা উচিত। তাই বলা হয়েছে "যোঽর্থৈর্হি শুচিঃ স শুচিঃ ন মৃদ্-বারিশুচিঃ শুচিঃ" অর্থাৎ 'অর্থার্জনে যে শুচি, সেই শুচি। শুধু মৃত্তিকা এবং জলের দ্বারা শুচিতা নিষ্পন্ন হয় না'। যদিও একজন ব্যক্তি জীবনযাপনের জন্য অর্থ লাভে সচেষ্ট হতে পারে, তবুও যাতে আসক্তি না জন্মে সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে এবং জীবনযাপনের প্রয়োজন মিটে গেলে অধিক অর্থ উপার্জন থেকে বিরত থাকতে হবে।

কাম ঃ ভারতীয় শাস্ত্রে কামকেও পুরুষার্থ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। কাম তৃতীয় পুরুষার্থ। সাধারণ মানুষ প্রবৃত্তি মার্গে বিচরণ করে। তারা জীবনের চরম লক্ষ্য যে আত্মোপলব্ধি বা ঈশ্বরোপলব্ধি, যা মোক্ষ বা মুক্তিকে সূচিত করে, সে সম্পর্কে

---

৬. "Philosophy of Values", M. Hiriyanna, *The Cultural Heritage of India*, Vol. III, p. 647.